ceÜ

ফুলবাড়ি কয়লা প্রকল্প কার লাভ কার ক্ষতি

আনু মুহাম্মদ

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেরই ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ যে চারটি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কার করে ফুলবাড়ি তার মধ্যে সর্বশেষ। অন্যগুলোর মধ্যে বড়পুকুরিয়ায় সম্প্রতি একটি 'দুর্ঘটনার' পর সেখানে কাজ বন্ধ। সেখানে যুক্ত ব্রিটিশ কনসালট্যান্ট দিয়ে আবার তদন্ত কমিটিও করা হয়েছে! ফুলবাড়ি কয়লা ক্ষেত্রটিতে অনুসন্ধান কাজ চলছে বলে বলা হয়। এই কাজে নিযুক্ত হয়েছে একটি ব্রিটিশ ফার্ম, এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড। এটি জ্বালানি ক্ষেত্রে কাজ করলেও কয়লা ক্ষেত্রে নতুন। অনুসন্ধান কাজ চালাচ্ছে বলা হলেও এই ফার্ম এমন সব বক্তব্য দিচ্ছে যাতে মনে হয় তাদের কয়লাখনি ইজারা দেয়ার ব্যাপারে আগে থেকেই অঙ্গীকার করা হয়েছে। গত ২ অক্টোবর সম্ভাব্যতা রিপোর্ট জমা দেবার সময় আগে থেকে ইজারা পাবার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া আছে কীনা এই প্রশ্নের জবাবে এশিয়া এনার্জির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেছেন, 'কোন ধরনের অঙ্গীকার না থাকলে কেউ এত টাকা খরচ করবে কেন?' (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ৩.১০.০৫)

জ্বালানি মন্ত্রণালয় আসলে কাদের

তাহলে প্রশ্ন হল, জ্বালানি উপদেষ্টা ও জ্বালানি সচিব যে একের পর এক বলছেন, কোন বোঝাপড়া হয়নি; তারা সিদ্ধান্ত নেবেন রিপোর্ট পর্যালোচনা করে, কয়লা নীতি চূড়ান্ত করবার পর, সেগুলো তবে কী? এই প্রতারণা, প্রহসন, ঢাকগুড়গুড়, নির্লজ্জ মিথ্যাচার এসবই আমরা দেখি খনিজ সম্পদ কেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে। তেলগ্যাস খাতে এই বিনিয়োগের সর্বনাশা রূপ এখন কিছু কিছু পরিষ্কার হয়েছে। কয়লা এখন আরেকটি ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র নিয়ে শুরু হয়েছে নানা তৎপরতা আর মূলা দেখিয়ে ঝোলা শেষ করার টাউট খেলা। মন্ত্রী, সচিবরা কিংবা চিহ্নিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বা দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞরা যখন উন্নয়নের কথা বলেন তখন আমরা তাই আতংকিত হয়ে পড়ি। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাই তাই। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কাজ যেখানে জ্বালানী সম্পদ রক্ষা ও তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সেখানে এরশাদ আমল থেকে শুরু করে কয়েক সরকারের সময়ে এই মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির দখল ও লুণ্ঠনের রাস্তা পরিষ্কার করা আর তারা ধরা পড়ে গেলে তাদের রক্ষা করা। এর মধ্য দিয়ে দখল ছাড়াও ঘটেছে মাগুড়ছড়া ও টেংরাটিলার মতো বিপর্যয়ের ঘটনা। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপদেষ্টাদের ভূমিকা দেখলে তাদের এদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি মনে হয় না, মনে হয় বহুজাতিক কোম্পানির কর্মচারি। আর এধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দুর্নীতির কুখ্যাতিকে যে যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এটাই ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

গত দুই দশকে এই মন্ত্রণালয় বিশেষত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা জ্বালানি খাতে দক্ষতা বা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বরং তারা এর অধীনস্ত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোকে, যেমন পেট্রোবাংলা, বাপেক্স, ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ, পরিকল্পিতভাবে পঙ্গু করেছে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে কিংবা প্রকৃত নিষ্ঠাবান বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ কর্মীদের তাড়িয়েছেন। পেট্রোবাংলায় এখন শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি পদ শূন্য (ডেইলি স্টার, ১৪.১০.০৫)। এসব শূন্যপদ পূরণ করবার বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজের আকর্ষণ বা পরিবেশ তৈরি যাতে না হতে পারে সেটাই যেন মন্ত্রণালয়ের চেষ্টা। এসব কাজ মন্ত্রণালয় করে দেশীয় সংস্থার ক্ষমতা ও দক্ষতা ধ্বংস করে শূন্যস্থান তৈরি করবার জন্য যাতে লুম্পেন বা বহুজাতিক সংস্থার দখলদারিত্ব হালাল করা যায় এবং তার মধ্যে দিয়ে কমিশন খেয়ে মোটা হওয়া যায়।

> কোম্পানির তথ্য অনুযায়ীই কয়লা খনিটি ১৩৫ বর্গ কিমি জুড়ে বিস্তৃত হবে। আর খনির কার্যক্রম পরিচালনায় পানি নিষ্কাশনসহ যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৫৬.৩৩ বর্গ কিমি।

সরকারি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশন মোটা এই গোষ্ঠীর কারণে আমাদের তেল-গ্যাস-কয়লা সম্পদ হুমকির মুখে, জনগণ এগুলোর জন্য অধিকতর বিপদের মুখে। ফুলবাড়ী সেরকমই এক বিপদের সংকেত দিচ্ছে। আজকে আমরা এই বিষয়টি নিয়েই নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমি এখানে এশিয়া এনার্জির প্রকাশিত কাগজপত্র থেকেই দেখাবো কীভাবে তারা সুবিধাজনকভাবে সত্য গোপন করে এবং ক্ষতিকে লাভ হিসাবে উপস্থাপন করে। এবং এই পর্যালোচনা থেকেই স্পষ্ট হবে বিদেশী বিনিয়োগ আর উন্নয়ন নামে যাকে মহিমান্বিত করা হচ্ছে তার আসল চেহারা। স্পষ্ট হবে এতে কার লাভ কার ক্ষতি।

আগেই পরিবেশ ছাড়পত্র

ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জি যেভাবে কাজ করছে, মিডিয়াতে তারা

যেভাবে কথা বলছে, যেভাবে তার দেশি 'বিশেষজ্ঞ' কর্মচারিরা প্রচারণার ব্যাপক আয়োজনে মেতেছে তাতে যে কারও মনে হতে পারে এই প্রতিষ্ঠান ইজারা পেয়ে গেছে। ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প নিয়ে এশিয়া এনার্জির বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় প্রচারিত বহুরঙা সুদৃশ্য প্রকাশনায় জনগণের উদ্দেশ্যে তাই অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। বহু ছবি ছাপানো হয়েছে এতে। হাসিমুখের নারীপুরুষ শিশু কিংবা সবুজ ধানক্ষেত। এসব ছবি দিয়ে এই সত্যটিই এখানে ঢেকে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এই সবুজ আর এই হাসিমুখ মুছে দেবার প্রকল্পই তারা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

এশিয়া এনার্জি ৬০০ পৃষ্ঠার সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দিয়েছে গত ২ অক্টোবর। কোম্পানির 'ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প' শিরোনামের প্রকাশনায় কোন তারিখ দেয়া নেই। এটি আমার হাতে এসেছে এই বছরের জুলাই মাসে। তার মানে নিশ্চয়ই তার আগে এটি প্রকাশিত। এতে বলা হয়েছে: 'ইতোমধ্যে স্মেক প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (আই ই ই) প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করেছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশগত, অবস্থানগত ছাড়পত্র পেয়েছে।' আর ৩ অক্টোবরের সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর তারা পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছেন। আসলে কবে পেলেন তারা ছাড়পত্র? নাকি একটি স্থায়ী ছাড়পত্রই দেয়া আছে? বাংলাদেশে পরিবেশ বিধ্বংসী কাজে অনুমোদন দেয়ার জন্যই কি পরিবেশ মন্ত্রণালয়? সম্প্রতি মাগুড়ছড়া ধ্বংসের দায় বহনকারি ইউনোকালকে শায়েস্তার ব্যবস্থা না করে রিজার্ভ ফরেস্ট ধ্বংস করে লাউয়াছড়া পাইপলাইন বসানোর অনুমতিও দিয়েছে এই মন্ত্রণালয়।

উন্নয়নের গল্প

সমীক্ষা শেষ হবার আগেই এশিয়া এনার্জি যে নিজেদের দখল নিশ্চিত জেনে জনগণকে বোকা বানানোর প্রচারণায় নেমেছে তার স্বাক্ষর তাদের প্রকাশনাতেই পাওয়া যায়। তারা বলেছেন, 'খনির ফলে চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। সামগ্রিকভাবে এই খনি এবং তার সহযোগী কারখানগুলো এই এলাকার দারিদ্র দূরীকরণের সহায়তা করবে।' (পৃ. ১৪) এই কথা তাদের বলতে হচ্ছে এই কারণে যে, উন্মুক্ত খনন কাজ অঞ্চলের পুরো বসতি উচ্ছেদ করবে, বিতাড়িত হবে দারিদ্র নয় দরিদ্র মানুষ। অধিক দারিদ্র্যের মধ্যে নতুনভাবে পতিত হবার কারণে চিকিৎসা যাদের জন্য হয়ে দাঁড়াবে বাহুল্য।

তারা আরও বলছেন, 'জরিপ করে দেখা গেছে, এই এলাকার সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অধিকাংশ জনগণ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (চারটি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ফুলবাড়ী পৌরসভার) কয়লাখনি প্রকল্পটি সমর্থন করেছেন।' (পৃ. ১৪) গত কয়েকমাসে এলাকার মানুষের ক্ষোভ ক্রোধ যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা সবাই জানেন এটা কত বড় মিথ্যাচার! তবে এটা ঠিক যে, তারা দালাল তৈরির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তারা বলছেন, 'সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ যেন পুনর্বাসন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ জানানোর সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে একটি দীর্ঘমেয়াদি মতবিনিময় প্রক্রিয়া চলছে।' (পৃ. ১৮) এগুলোরই আরেক নাম হতে পারে বিভ্রান্তি ও দালাল সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

উন্মুক্ত পদ্ধতির খনন প্রসঙ্গে তারা বলছেন, 'আনুমানিক ৩০ বছর ধরে খনির খনন প্রক্রিয়াটি কয়লাক্ষেত্রে লম্বালম্বি (উত্তর দক্ষিণে) অগ্রসর হবে' (পৃ. ৬) আর এর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য বলছেন, 'যদিও বাংলাদেশে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিটি নতুন কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে একই রকম ভূতাত্ত্বিক ও হাইড্রোলজিকাল অবস্থা বিদ্যমান, যেমন অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং জার্মানিতে এই পদ্ধতিটি সফলভাবে পরীক্ষিত এবং এটি অধিক ফলদায়ক ও নিরাপদ।' (পৃ. ৫) এরকম পাইকারি তুলনামূলক সিদ্ধান্ত বিশেষজ্ঞ মত হিসেবে প্রচার যে দুরভিসন্ধিমূলক তা বলাই বাহুল্য। অন্য প্রশ্ন বাদ দিলেও শুধু জনঘনত্ব বিচারে ফুলবাড়ী ঐসব দেশের বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি সম্পর্কে কোম্পানি বলছে, এই খননকাজের ফলে 'সম্পদের পরিপূর্ণ উত্তোলন সম্ভব হওয়ার কারণে খনির মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে, আর্থ-সামাজিক সুবিধা, চাকরির সুযোগ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে।' (তথ্যপত্র ৩)

সামান্য ক্ষতি

আর তাদের প্রকাশনাতেই বলা হচ্ছে, 'প্রাথমিকভাবে উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লা খনির জন্যই প্রায় ২০০০ হেক্টর জমি প্রয়োজন হতে পারে। খনির মেয়াদকালে খনি ও সহযোগী স্থাপনার জন্য প্রায় ১০০০০ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। ফলে এই এলাকায় কৃষিজমির ক্ষতি হতে পারে এবং ফুলবাড়ী এলাকার পূর্ব পার্শ্ব এবং এর চারিদিকে বসবাসরত জনগণ, গ্রাম ও বসত বাড়ি সরিয়ে নিতে হতে পারে।' এই ক্ষতি কতটা আর সে ক্ষতি লাভের তুলনায় বেশি না কম?

ক্ষতির কথা বলেও তারা ভরসা দিচ্ছেন যে, এর ফলে 'খনির প্রথম পর্যায়ে কৃষিজমির সামান্য ক্ষতি ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে খনির সম্ভাব্য এলাকায় বসবাসরত জনগণের উপর খুব সামান্যই প্রভাব পড়বে।' যেমন 'খনি অগ্রগতির প্রথম ৫ থেকে ১০ বছরে ১৫০০০ থেকে ২০০০০ জনগণকে পুনর্বাসন করতে হতে পারে এবং খনির ৩০ বৎসর মেয়াদকালে এই এলাকার মোট ৫০০০০ লোককে পুনর্বাসন করতে হতে পারে। প্রধানত, ফুলবাড়ী শহরের একাংশ এবং এর পার্শ্ববর্তী উপজেলা যথা বিরামপুর, নবাবগঞ্জ ও পার্বতীপুর উপজেলার কিছু গ্রাম থেকে লোকবসতি সরিয়ে নিতে হতে পারে। নতুন শহর, গ্রাম ও নতুন সংযোগ সড়ক তৈরি করার জন্যও কিছু বসতি বা স্থাপনা সরানো হতে পারে।' (পৃ. ১৬) এসবই তাদের দৃষ্টিতে 'সামান্য ক্ষতি'।

এশিয়া এনার্জি জানাচ্ছে, 'কৃষি জমির যে ক্ষতি হবে তার ভারসাম্য বজায় রাখতে অবশিষ্ট জমিতে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা হবে প্রতিটি প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। জমি হারানোর ফলে যে সমস্ত বর্গাদার চাষী তাদের জীবিকা হারাবে তাদের জীবিকার নিশ্চয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা এবং আঞ্চলিক কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করারও পরিকল্পনা রয়েছে।' (পৃ.১৯) কীভাবে করা হবে 'অবশিষ্ট জমিতে অধিক পরিমাণে উৎপাদন'? হাইব্রিড? আর অবশিষ্ট জমি কোথায়? সারা বাংলাদেশে? এসব জায়গায় কে ধানচাষ করবে? অধিক ধান চাষ করবার জন্য আরও জমির মালিকানাস্বত্ত্বও কি তবে তাদের দিতে হবে?

শুধু কৃষিজমি নয়, 'বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয়, আঞ্চলিক (বগুড়া-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর) রাস্তা এবং উত্তর দক্ষিণ বরাবর রেল লাইনের অংশ সরানোর প্রয়োজন হতে পারে।' তাছাড়া 'নিরাপদ ও শুষ্ক খনন ক্ষেত্র তৈরি করতে কয়লা খনির ভেতর ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ কমানোর প্রয়োজন হবে, যা আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি সরবরাহে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।' (পৃ.২০) এগুলোর ভয়াবহতা ঢেকে রাখবার জন্য এবিষয়ে আর বিস্তার করা হয়নি।

সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব এবং ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কোম্পানির আরেক প্রকাশনায় আরও বলা হচ্ছে:

- বর্তমানে ধারণা করা হচ্ছে যে, প্রায় ১০০০০ হেক্টর জমি এই খনির জন্য প্রয়োজন হতে পারে

ফুলবাড়ী কয়লাখাতে বিদেশী বিনিয়োগ : কার লাভ কার ক্ষতি

কত ব্যয়	কত আয়	কত লাভ/ ক্ষতি
এশিয়া এনার্জি, ব্রিটিশ কোম্পানি	৯ হাজার ২৫০ কোটি টাকা অথবা ৭৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা	১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকাঅথবা ৭১ হাজার কোটি টাকা লাভ : ১ লক্ষ ৪১ হাজার কোটি
বাংলাদেশ	৫৪ হাজার কোটি টাকা	৪৫ হাজার কোটি টাকাক্ষতি: ৯ হাজার কোটি টাকা (জীবন ও পরিবেশসহ বিভিন্ন ক্ষতি বাদ দিয়ে)

যার অংশবিশেষ খনির গর্ভে চলে যাবে আর অন্য অংশ ব্যবহার করা হবে খনির ভেতরের রাস্তা, অফিস, ওয়ার্কশপ, মাটি ও পাথর রাখার জায়গার জন্য। কোন অংশ চলে যাবে রেল এবং জাতীয় সড়ক স্থানান্তর করতে, আবার কিছু যাবে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্বাসনে। এই জমির অবস্থান ফুলবাড়ী, বিরামপুর, নওয়াবগঞ্জ আর পার্বতীপুর উপজেলায়। এসব জমি এখন প্রধানত, কৃষি আর বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (তথ্যপত্র নং ৩, মার্চ ২০০৫)

- ধারণা করা যায় যে, ফুলবাড়ী শহরের কিছু অংশ এবং ফুলবাড়ী পৌরসভার এবং হামিদপুর, জয়পুর, খানপুর, খায়েরবাড়ী ও শিবনগর ইউনিয়নের কিছু গ্রাম খনি এলাকার ভেতরে পড়বে। গোলাপগঞ্জ, আলাদিপুর, ও দৌলতপুর ইউনিয়নের সামান্য কিছু অংশও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পড়বে। প্রায় দশ হাজার বাসস্থান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এসবেরই পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে। (ঐ)
- কিছু সাধারণ সম্পত্তি যেমন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, হাটবাজার, কবরস্থান, ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এগুলোর পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে।

কোম্পানির এই বর্ণনা আংশিক এবং উপরন্তু তা অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি এবং মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করেনি।

লাভ ক্ষতির সমীকরণ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী মুনাফা বৃদ্ধি পাবে আর তাদের কত ক্ষতি হবে সেটা এবার আমরা একটু দেখি। ফুলবাড়ি খনিতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ সর্বশেষ হিসাবে প্রায় ৫৭২ মিলিয়ন টন। (সাংবাদিক সম্মেলন, ৩.১০.০৫) কোম্পানি আরও বলছে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে এর শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ তোলা যাবে কিন্তু উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতে তোলা যাবে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ। 'প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হবে এবং ২০১১ সাল নাগাদ এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বছরে ১৫ মিলিয়ন টন হবে।' (পৃ. ৪) পরিকল্পনা হল এর মধ্যে ১২ মিলিয়ন টন রফতানি করা যার মধ্যে ৪ মিলিয়ন টন যাবে ভারতে। শুধু ৩ মিলিয়ন টন দেশের ভেতর ব্যবহার হবে (সাংবাদিক সম্মেলন, ২.১০.০৫)। এই কয়লা ছাড়াও এই খনিতে আছে উন্নতমানের সিলিকা (বালি), সিরামিক বালি ও মাটি, মধুপুর ক্লে, নুড়িপাথরসহসহ উন্নতমানের পাথর।

শুধু কয়লার দাম ধরলেও প্রতিবছর প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা হিসেবে ৩০ বছরে কোম্পানি আয় করবে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা। এই সময়কালে তারা বিনিয়োগ করবে প্রকাশনার হিসেবে ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার বা ৯২৫০ কোটি টাকা (পৃ.৮) এবং সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত হিসাবে (২.১০.০৫) ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৭৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা। কয়েক মাসের ব্যবধানে তাদের দেয়া বিনিয়োগ হিসাব বেড়ে গেছে ৭০ হাজার কোটি টাকা বা শতকরা ৮৫৬ ভাগ। পরের হিসাবে মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য খরচ হবে শুধু ১৩ হাজার কোটি টাকা, বাকিটা অপারেটিং খরচ। এর মধ্যে বেতন, সফর, পানীয় সবই অন্তর্ভুক্ত। খরচ বাড়তি দেখিয়ে অর্থ পাচার এধরনের সংস্থাগুলোর সাধারণ প্রবণতা। সেগুলো আপাতত উপেক্ষা করে তাদের পরবর্তী হিসাব সত্য ধরে নিলেও মুনাফার হার দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। আর আগের হিসাবে লাভের হার ১৬২১ ভাগ।

অন্যদিকে, কোম্পানির ভাষ্যমতে, বাংলাদেশ শতকরা ৬ ভাগ রয়ালটি ও ট্যাক্স মিলিয়ে ৩০ বছরে পাবে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা। বছরে দাঁড়ায় ১৫০০ কোটি টাকার একটু বেশি (সাংবাদিক সম্মেলন, ২.১০.০৫)। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বর্তমানে বছরে বাংলাদেশ যে রফতানি আয় করে তার পরিমাণ ইতিমধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিবছর প্রবাসীরা দেশে যে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায় তার পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। ৩০ বছরে একবছরের রফতানি আয়েরও কম কিংবা দুই বছরের রেমিটেন্সএরও কম আয় করে 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে' বলে দাবি করছে কোম্পানি। আর সেই আয় করতে বাংলাদেশের খরচ কত? কত তার অর্থনৈতিক ব্যয় কত তার সামাজিক ব্যয়? সেসম্পর্কে কোম্পানির কিছু কথা আংশিক চিত্র আনলেও তার পরিষ্কার হিসাব দেয় না।

কোম্পানির তথ্য অনুযায়ীই কয়লা খনিটি ১৩৫ বর্গ কিমি জুড়ে বিস্তৃত হবে। আর খনির কার্যক্রম পরিচালনায় পানি নিষ্কাশনসহ যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৫৬.৩৩ বর্গ কিমি। এই এলাকাটি খুবই উর্বর, কৃষিফলন খুব ভালো, তিনফসলী প্রায় সব জমি, অর্থনৈতিকভাবে খুবই সক্রিয় জনগোষ্ঠী, অকৃষিখাতের তৎপরতাও দ্রুত সম্প্রসারণশীল, বসতি খুবই ঘন। খনি কার্যক্রমের সাথে সাথে এই পুরো এলাকার কৃষি পশুপালন মৎস্য বনজ ইত্যাদি সকল তৎপরতা অজানা কাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কী কী আছে তার মধ্যে? এর মধ্যে আছে আমন আউশ ইরি বোরো ধান, গম, সরিষা, আলু, ভুট্টা, কলা, আখ, পাট, মরিচ, রসুন, পেঁয়াজ, শাকসব্জি, অগুণতি ফলজ ও বনজ বৃক্ষ, নদী, বিল, সহস্রাধিক মৎস্য খামার, হাঁসমুরগী গবাদীপশু ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া আছে ছোট বড় অনেক দোকানপাট ব্যবসা। পুরো এলাকার এসব অর্থনৈতিক তৎপরতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। এই হল কোম্পানির দৃষ্টিতে সামান্য ক্ষতি। এতে কত ক্ষতি হবে সেটা তাই হিসাব করেনি কোম্পানি কিন্তু এলাকার মানুষ করেছেন। সেই হিসাব মতে এর পরিমাণ, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাব করে, বছরে ১৮০০ কোটি টাকা।

শুধু এই হিসাবে নিজেদের কয়লা সম্পদ কোম্পানির মুনাফা গঠনে দিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বার্ষিক ক্ষতি দাঁড়াবে ৩০০ কোটি টাকা। সেটাই হল কোম্পানির দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির মুনাফা। আর যদি প্রাণবৈচিত্র ধ্বংস, পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট এবং মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, শারীরিক ক্ষতি হিসাব করা যায় তাহলে এর পরিমাণ আরও বহু বেড়ে যাবে। তারা বলছেন, 'খনির কার্যক্রম চলাকালীন প্রত্যক্ষভাবে স্বল্পমেয়াদী ২১০০টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ১১০০টি চাকুরির সুযোগ ঘটবে।' (পৃ. ১২) বলেননি তারা একইসঙ্গে লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা ধ্বংস করবেন। যে কর্মসংস্থান তারা করবেন সে সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশ শতকে কয়লা খনিতে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বিভিন্ন দেশের ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ। খনিতে যারা কাজ করেন তাঁদের শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর সমস্যা হয়। আয়ু অনেক কমে যায়। আশে পাশের অঞ্চলের মানুষেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। কোম্পানি মালিকেরা এসব হিসাবে নেন না।

ভবিষ্যৎ ফুলবাড়ী

যদি এশিয়া এনার্জির এবং এর সাথে জড়িত দেশী কমিশনভোগীদের পরিকল্পনা সফল হয় তাহলে বিরাট মুনাফা নিয়ে বিদেশী কোম্পানি এই দেশ ত্যাগ করবে, দালাল লুম্পেনরা কমিশনের টাকা দিয়ে স্ফীত হবে, আর বর্তমানের সবুজ শ্যামল কর্মচঞ্চল ফুলবাড়ী একটা বিরান ও বিশাল হা নিয়ে পড়ে থাকবে। এই অঞ্চলের মানুষদের অবস্থা কী দাঁড়াবে তা বলার কোন উপায় নেই। বছর বছর অর্থনীতির ঘাটতি তো আছেই।

এখন আবার বিদ্যুতের মুলো ঝোলানো হয়েছে। কয়লা বিদ্যুৎ এর যে খরচ তা আরেক অবিরাম ঘাটতির ক্ষেত্র। টাটা যে হিসাব দিয়েছে তাতে বিদ্যুতের দাম একলাফে দ্বিগুণ হবে। এখানে স্মরণ করি কাপ্তাই বাঁধের কথা। উন্নয়নের আরেক বীভৎসতার স্বাক্ষর। লক্ষাধিক মানুষকে ভাসিয়ে দিয়ে উদ্বাস্তু করে এখানে বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়েছিল। সেই মানুষেরা এখনও সবাই ক্ষতিপূরণ পাননি, বহুজনে দেশছাড়া, আর এ থেকে যে অবিশ্বাস আর সংঘাতের জন্ম তার মাশুল দেবার জন্য প্রতিবছর জনগণের করের অর্থ থেকে ব্যয় হচ্ছে কমপক্ষে ৩০০ কোটি টাকা। মানুষের জীবন, দশক দশক সংঘাত রক্তপাত, অশান্তি এসবের দাম কে ধরবে? আর সর্বশেষ খবরে জানা যায়, এত বিশাল মূল্য দিয়ে যে বিদ্যুৎ প্রকল্প সেটাও এখন সংকটাপন্ন। বিদেশী বিনিয়োগ আর উন্নয়নের ডামাডোলে ফুলবাড়িতে ঘটতে যাচ্ছে কাপ্তাই, মাগুড়ছড়া আর টেংরাটিলার ধ্বংসযজ্ঞের সম্মিলিত এক ভয়ঙ্কর ঘটনা।